বাংলার ছোটগল্প

সপ্তম খণ্ড

সম্পাদনা
ড. বিজিত ঘোষ

পুনশ্চ
৯এ নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রাসঙ্গিক কয়েকটি কথা ঃ সপ্তম খণ্ড

সপ্তম খণ্ড শুরু করেছি এ-কালের বিতর্কিত লেখক সুবিমল মিশ্রের গল্প দিয়ে। নির্বাচিত গল্পটি ছাড়াও তাঁর 'হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়া অথবা সোনার গান্ধীমূর্তি', 'পার্কস্ট্রীটে ট্রাফিক পোস্টে হলুদ রঙ' গল্পগুলি সুপরিচিত।

সুব্রত সেনগুপ্তের 'গোপন দূত', 'জামা', 'টম্যাটো', 'হাতি', 'গোপালের টালবাসা', 'পুরনের সঙ্গে', 'এক্কা দোক্কা', 'পাউরুটি' সমসময়ের উল্লেখযোগ্য গল্প।

শৈবাল মিত্রের অসামান্য বেশ কিছু গল্পের কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ে যাচ্ছে। যেমন, 'আতর আলির রাজসজ্জা', 'সংগ্রামপুর যাত্রা', 'শবসাধনা', 'ধর্মের কল', 'খয়ের খাঁর ইন্তেকাল', 'মান্য মাইতির আইন অমান্য', 'কম্‌লি তুই ঘরে যা', 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার একটি রিপোর্ট', 'স্বপ্নলব্ধ সত্য' ইত্যাদি।

কল্যাণ মজুমদারের 'কোঁচ', 'স্বপ্ন বিপণি'; সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'মা', 'মুক্তিপণ', 'রক্তিম বসন্ত', 'জ্যোৎস্নায় পার্লামেন্ট', 'পাতক', 'ভেজা তবলার বোল'; মিহির ভট্টাচার্যের 'বাল্মীকির মা', 'সুন্দরের সাধনা'; অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়ের 'আজ কাল পরশুর গল্প'; উদয় ভাদুড়ীর 'চলো হস্তীকান্দা', 'দ্বৈরথ'; প্রবীর ঘোষের 'সম্বন্ধ', 'কব্জা', 'অনাটকীয়', 'ছয় মিনিটের গল্পমালা', 'চোর' গল্পগুলির কথা উল্লেখের দাবী রাখে।

অভিজিৎ সেনের 'দেবাংশী', 'ব্রাহ্মণ্য', 'মেরুবিন্যাস', 'মৌরসীপাট্টা'; পীযূষ ভট্টাচার্যের 'কুশপুত্তলিকা'; ভগীরথ মিশ্রের 'জাইগেনসিয়া', 'বিশ্বরূপে রাখাল', 'লাবণের বয়স', 'বাঘের ডাক', 'হুলমারার ভোমরা মাঝি', 'কার্তিকের কড়চা', 'মায়ের জন্য', 'ঝোর-বন্দী' অবিস্মরণীয় সব গল্প।

মনে পড়ছে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইঁদুর', 'রাজকুমারীর অসুখ', 'প্রধানমন্ত্রীর সফর', 'হরিণের মাংস', 'ওরা তিনজন', 'মুখ্যমন্ত্রীর উপহার'; সিদ্ধার্থ ঘোষের 'বার্তা', 'জনক', 'রিপোর্টাজ'; শংকর বসুর 'মহড়া'; শংকর দাশগুপ্তের 'অন্ধসুখ', 'আত্মপক্ষের একদিন'; ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'সমুদ্রগন্ডি', 'নোনা হাড়' প্রভৃতি গল্পগুলির কথাও।

এছাড়া মনোজ দাসের 'হুতোম', 'পান্তি', 'বিপ্লব ও কমরেড হরিচরণ'; জয়ন্ত জোয়ারদারের 'একজন সি. আর. পি ও একটি নকশাল ভূত' প্রভৃতি গল্পগুলি আমার কাছে যথেষ্ট উচ্চমানের বলে মনে হয়েছে।

এই খণ্ডটি শেষ করেছি মহাশ্বেতা দেবীর পুত্র হিসেবে নয়; স্বনামখ্যাত বিশিষ্ট সাহিত্যিক নবারুণ ভট্টাচার্যের গল্প দিয়ে। এই খণ্ডে গল্পের সংখ্যা ৩৯। সময়সীমা ১৯৪২ থেকে ১৯৪৮।

পুনশ্চ ঃ বিশেষ উৎসাহী/আগ্রহী সহৃদয় পাঠকদের জ্ঞাতার্থে কয়েকটি কথা। দশ খণ্ডের 'বাংলার ছোটগল্প' গ্রন্থের **কেবলমাত্র প্রথম খণ্ডেই রয়েছে বাইশ পৃষ্ঠার একটি তথ্যসমৃদ্ধ দীর্ঘ ভূমিকা**। সেখানে আছে বাংলা গদ্যের সূচনা, গদ্যগ্রন্থ, গদ্য-সাহিত্য, আদি-গল্প, গল্প; ছোটগল্পের আবির্ভাব ঃ তার জন্ম ও উৎস সন্ধান, সংজ্ঞা ইত্যাদি বিষয়ের উপর দীর্ঘ আলোচনা। আছে অসংখ্য ছোটগল্প সৃষ্টির অনিবার্য প্রেরণা হিসেবে অপরিহার্য পটভূমি

সমূহের (ভারতবর্ষের বহু বিচিত্র সামাজিক পরিস্থিতি, নানা ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-সংঘাত-সংঘর্ষ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের নানাবিধ সমস্যা, সংকট ইত্যাদি) তথ্য ও প্রমাণ সহযোগে বিস্তৃত বিশ্লেষণ।

বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামন্বন্তরে ভেঙে পড়া বাংলার সমাজ-অর্থনীতি; **দেশভাগ, খণ্ডিত-স্বাধীনতা-প্রাপ্তি, উদ্বাস্তু স্রোত**; সেই মহা-প্রলয়ের সময়ের জীবন্ত ছবিও (এক-একটি কালজয়ী গল্পের সঙ্গে যে পটভূমির অঙ্গাঙ্গী যোগ) প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় আমি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আগস্ট অন্দোলন, ১৯৪৬-এর ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা তথা **'গ্রেট ক্যালক্যাটা কিলিং'** আর ঠিক তার পরই **তেভাগা আন্দোলন**; পরবর্তীকালে **'নকশাল আন্দোলন', 'জরুরী অবস্থা'**, বার বার বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির উত্থান, — এ-সব কিছুই বাংলার গল্পকে দিয়েছে নতুন প্রাণ। তারও অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সেখানে করেছি আমি।

আবার বিভিন্ন সাহিত্য-আন্দোলন (**'কল্লোল', 'শ্রুতি', 'হাংরি জেনারেশন', 'শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য আন্দোলন,' 'এই দশক', 'নিম সাহিত্য-আন্দোলন', 'নতুন রীতির গল্প আন্দোলন'** ইত্যাদি); লেখক-পাঠক-সম্পাদক-প্রকাশকের ছোটগল্প ব্যাপারে দায়িত্বহীনতা ও দায়িত্বের কথা; সর্বোপরি পাঠকের কাছে সে-কাল ও এ-কালের ছোটগল্পের প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণের সম্ভাব্য কারণগুলিও বিশ্লেষিত হয়েছে সেই ভূমিকায়।

তাই, উৎসুক শ্রদ্ধেয় পাঠক সেটি একবার দেখে/পড়ে নিলে সম্পাদকের শ্রমের ভার কিছুটা লাঘব হবে।

(ড. বিজিত ঘোষ)

শ্রীরামপুর
বইমেলা ২০০২

সূচীপত্র

সুবিমল মিশ্র	শেয়ালদা স্টেশন ও কপালকুণ্ডলা	১১
সুব্রত সেনগুপ্ত	সুলেমানের বিচার	১৪
দেবব্রত মল্লিক	জাফরি	২১
হীরালাল চক্রবর্তী	রক্তিম বর্ণমালা	২৮
সুনীল দাশ	অস্ত্রলেখা	৩৮
শৈবাল মিত্র	হরধনু কাহিনীর পুনর্লিখন	৪৭
সুব্রত নিয়োগী	রতির গোপন প্রেমিক	৫২
কল্যাণ মজুমদার	ঝুল-ঝাঁপ্পি	৫৭
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	কান্না	৬৮
সাধন চট্টোপাধ্যায়	ভারততীর্থ	৮১
মিহির ভট্টাচার্য	সুন্দরের সাধনা	৮৭
অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়	বাহাদুরের বাজনা	৯৩
বারিদবরণ চক্রবর্তী	রাক্ষসায়ন	১০১
হীরেন চট্টোপাধ্যায়	পতনের পর	১১৭
উদয় ভাদুড়ী	ময়না তদন্ত	১২৮
ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য	নাজমা মা হলো	১৩৮
প্রবীর ঘোষ	চারজন	১৪৩
কণা বসু মিশ্র	ঊর্মি	১৪৭
অভিজিৎ সেন	আপস	১৫৫
কাজল মিত্র	টিনের-টগর	১৬১
তৃষিত বর্মণ	তুরুপের তাস	১৬৫
প্রলয় শূর	নটী	১৭৮
চন্দন ঘোষ	বারবণিতার সাথে কিছুক্ষণ	১৮৩
দীপেন্দু চক্রবর্তী	জনতার সন্ধানে	১৯৪
পীযূষ ভট্টাচার্য	শেষ রাতের ট্রেন	২০১
সুব্রত বড়ুয়া	বুলি তোমাকে লিখছি	২০৫
সেলিনা হোসেন	ছায়াসূর্য	২১১
ভগীরথ মিশ্র	রাবণ	২১৫
তপন বন্দ্যোপাধ্যায়	ফড়িঙ হইল পক্ষী	২৩০
তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	ব্যাঙ্কোর চেয়ার	২৩৯
গৌর বৈরাগী	স্মরণ সভার তারিখ	২৪৪

সিদ্ধার্থ ঘোষ	জনক	২৪৮
স্বর্ণ মিত্র	প্রসব	২৫৮
শংকর বসু	অকাল বোধন	২৬২
শংকর দাশগুপ্ত	আগুনের ছবি	২৬৮
ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়	কাপড়ের ব্যাগ	২৭৫
মনোজ দাস	মুখোমুখি	২৭৭
জয়ন্ত জোয়ারদার	জন্মান্তর	২৮৪
নবারুণ ভট্টাচার্য	কাকতাড়ুয়া	২৮৭

শেয়ালদা স্টেশন ও কপালকুণ্ডলা

সুবিমল মিশ্র

এগারটা দশের লোকাল তারা ধরবে। কিন্তু ধরতে পারলনা, কয়েক সেকেন্ডের জন্য গাড়ীটা বেরিয়ে গেল। তখন তারা কি করবে।

গুরুদয়াল বলবে বেশ হয়েছে আমড়া গাছে আম ফলেছে

নবকুমার মুখ শুকনো করে বলবে এখন উপায়

তৃতীয়জন ভজগোবিন্দ বলবে চল দুটো অন্ধ মেয়ে খুঁজে আনি আর তাদের রাস্তা পার করে দিই

এখন অন্ধ মেয়েদের কি গরজ পড়েছে রাস্তা পেরোতে যাবার। তারা রাস্তা না পেরোলেও পারে।

অর্থাৎ কিছুই করার থাকবে না। গুরুদয়াল নিজেকে বক দেখাবে। জিজ্ঞাসা করলে বলবে ঃ শেয়ালদা স্টেশানে আজ রাত্তির কাটাব। বলে, এক চক্কর ঘুরে নিয়ে নবকুমারের থুতনি ধরে ঃ মানিনী মান কৈরো না। নবকুমার যদি রেগে গিয়ে থাকে বলবে ঃ ধ্যুৎ, সবসময় ইয়ার্কি ভাল্লাগেনা

সবসময় কি ভাল্লাগে চাঁদ

আয় আয় চাঁদমামা টিপ দিয়ে যা

কার কপালে টিপ দেবে

খোকার, থুড়ি নবকুমারের কপালে

কারণ

নবকুমার যে সেই কাষ্ঠাহরণে গিয়াছিল আর ফিরে নাই। কপালকুণ্ডলার যাত্রীরা তাহার ফিরিবার আশায় বসিয়া আছে।

নবকুমার কি আর ফিরিবে

না নবকুমার আর ফিরিবে না তাহাকে বাঘে খাইয়াছে

সত্যি যদি নবুকে বাঘে খেতো তাহলে বঙ্কিমচন্দ্র কি করে উপন্যাস লিখতো

লিখতো না

সব্বোনাশ হতো তা হলে....বিশ্বাস কর মাইরি আমি মেয়েটাকে নদী থেকে উঠে আসতে দেখেছি...ঠিক তেমনি চুল...নাক....মুখ...

সত্যি মেয়েটার জন্য বুকের কাছটায় বড্ড বেশী ক্যামন ক্যামন করে...

কেউ বুঝলনা... না নবকুমার... না কাপালিক না...

জানিস সেই দুঃখে আজও মেয়েটা কাঁদে

মাঝ-সন্ধ্যেয় দেখিস শেয়ালদা স্টেশানের বস্তি থেকে বেরিয়ে অভিমানিনী কপালকুণ্ডলা রেল-লাইনের অন্ধকারে আত্মহত্যা করতে যায়

আমিও শুনেছি

কি

কপালকুণ্ডলাকে কাঁদতে....ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে...সীমান্তের ওপার থেকে

আমিও দেখেছি

কি

ভিখিরী হয়ে যেতে...জানিস কপালকুণ্ডলা এখনো তোবড়ানো টিনের বাটি হাতে ফুটপাতে ভিক্ষে করে বেড়ায়...হ্যাঁরে এই দেশে...আমাদের এই কলকাতায়...হ্যাঁরে

তোরা গাঁজা খেয়েছিস নবকুমার বলবে

নবুর বিশ্বাস হচ্ছে না ওকে সরেজমিনে দেখাতে হবে এখন রাত কটা

এগারোটা বেজে কুড়ি

আছে চল দেখাই

কে

কপালকুণ্ডলা

কোথায়

নবকুমারকে টানতে টানতে স্টেশন এলাকার বাইরে আনবে। নিওন আলোর নিচে নিজের নিজের ছায়া মাড়িয়ে দাঁড়াবে।

তিনবার ডিগবাজী খা

কেন

নিয়ম

তারা তিনজন তিনবার করে একুনে ন'বার নিওন আলোর তলায় ডিগবাজী খাবে।

কান ধর দু'হাতে

যাহা দেখিব সত্য দেখিব সত্য ছাড়া কখনো মিথ্যা দেখিব না

তারা বলবে এবং তাদের মধ্যে যে কেউ একজন, গুরুদয়াল বা ভজগোবিন্দ, আঙুল দেখাবে। নবকুমার দেখবে একটা মেয়ে দূরে বাসস্টপের কাছে লাইটপোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে আছে।

এই সেই কপালকুণ্ডলা

নিকটস্থ হলে তার শাড়ির মেরুন রঙ সে শাড়ি বহুব্যবহারে অতীব শীর্ণ, গালে চোয়ালের হাড় ও খড়ির গুঁড়ো, ঠোঁটের রক্ত ইত্যাকার স্পষ্ট হবে।

তোমার নাম কপালকুণ্ডলা

মেয়েটি তার রক্তাক্ত ঠোঁটে হাসবে।

নামে কি আইসে যায়

তুমি এখানে কেন কপালকুণ্ডলা

আপনাগো আনন্দ দ্যাওনের লেইগ্যা রাজাবাবু

কপালকুণ্ডলা তোমার মনে কি অনেক অভিমান

অভিমান...নাঃ

দুঃখ

নাঃ

তবে তোমার মনে কি কপালকুণ্ডলা

মনে...হি হি হি মন নিয়া কি হইবো বাবু শাড়ি বেলাউজ খুইল্যা দিমু...

কপালকুণ্ডলা তোমার দুঃখ হয় না

দুঃখু কারে কয় গো হি হি হি দুঃখু-কষ্ট আমাগো থাকতে নাই...তা রাজাবাবুগো টাকা আছে না বিনা পয়সায় স্ফূর্তির ধান্দা

এই কথায় নবকুমারের বুকের রক্ত ছলাৎ ছলাৎ করে উঠবে, বলবে, হাঁ স্ফূর্তি করব পয়সা আছে

কিন্তু কি করে স্ফূর্তি করা যায়

কেন রেললাইন আছে চলন্ত ট্রেন আছে চমৎকার স্ফূর্তি করা যাবে...সবাই মিলে চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ খেলেই হল

ছটাকী হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠবে। পাশের ঝোপড়ি থেকে ভেসে আসা কান্নার শব্দ সে শুনতে পাবে ঃ যা করবার তাড়াতাড়ি কইর‍্যা নাও বাপু আমার পোলা কান্দতিছে

কপালকুণ্ডলার পোলা

কেন বেশ্যা বলে কি ছেলেপুলে থাকবে না নাকি

কপালকুণ্ডলা তোমার নবকুমারটি কোথায়

গলায় কলসী বাইন্ধ্যা গঙ্গায় ডুইব্যা গ্যাছে।

বেশ করেছে চল আমরা রেললাইনের অন্ধকারে গিয়ে স্ফূর্তি করি

তারা আলো পেরোবে অন্ধকার পেরোবে। আবার অন্ধকার পেরোবে আলো পেরোবে। এমনি করে একসময় না-আলো না-অন্ধকার রেললাইন পেয়ে যাবে।

তারা চারজন

গুরুদয়াল বলবে দ্যাখ আমরা আজ আমাদের লাস্ট ট্রেন ফেল করেছি

ভজগোবিন্দ বলবে কানা ভিখিরী পাইনি কিন্তু কপালকুণ্ডলা পেয়ে গেলাম

নবকুমার বলবে শালা যা থাকে কপালে এসেছি যখন স্ফূর্তি করে যাব

ছটাকী খদ্দেরদের মন রাখার জন্য বলবে ক্যামন চমৎকার জায়গা না...প্রতিদিন আত্মহত্যা করতে এইনে আইতে হয় আমারে...এই

র‍্যাললাইনে

কপালকুণ্ডলা আমার ডিগবাজী খেতে ইচ্ছে করছে

কপালকুণ্ডলা আমার জোরে জোরে কিছু একটা চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে

কপালকুণ্ডলা এসো তুমি আর আমি দুজনে মিলে একটা খেউড় গাই

যা করবার শিগগির কইর‍্যা লাও আমার পোলা কান্ত্যাছে

কপালকুণ্ডলা ট্রেন লাইনের ওপর অনেক রক্ত শুকিয়ে আছে দেখতে পাচ্ছি

হইব না...প্রতি সন্ধ্যায় আইস্যা আত্মহত্যা কইর‍্যা যাই যে...আমাগো সব রক্ত শুকাইয়া লোহার উপর জং পইড়্যা গেছে

নির্জন রেললাইনগুলোতে আজকাল কারা যেন এসে চুপিচুপি আত্মহত্যা করে যায়

সেই রক্তের গন্ধ

বসতিতে ভেসে এলে

মানুষ ক্লান্ত ও

বিষণ্ণ হয়

কপালকুণ্ডলা তোমার ছেলে কাঁদছে তুমি আত্মহত্যা করবে না

এসো আমরা সবাই মিলে স্ফূর্তি করি

ইঞ্জিন ছুটে আসছে একচক্ষু দৈত্যের মত

কে আগে ঝাঁপ খাবে

আগেপিছে নয় ঝাঁপ খেতে হবে একসংগে পিষে যেতে হবে একই চাকার তলায়

তা হলে এসো আমরা একসংগে স্ফূর্তি করি এই রাত স্মরণীয় হয়ে থাকুক কপালকুণ্ডলা তুমি কিন্তু বললে না তোমার কিসের অভিমান পাশের ঝোপড়িতে তোমার ছেলে কাঁদছে আমরা শিগগির করে বসে নিচ্ছি কপালকুণ্ডলা...

সেই সময় ইঞ্জিনের তীব্র আলো, প্রাচীন বৃক্ষের মত ঋষিকল্প সেই আলো তাহাদের শরীরে আসিয়া পড়িবে। তাহারা সেই আলোর চত্বরে দাঁড়াইয়া আকাঙ্খিত স্ফূর্তির জন্য, পরস্পর রক্তসান্নিধ্যের জন্য অপেক্ষা করিবে।

সুলেমানের বিচার

সুব্রত সেনগুপ্ত

সুলেমান আগে গলফ ক্লাবে কাজ করতো। কাজ ছিল খেলার সরঞ্জাম বয়ে নিয়ে যাওয়া, বয়ে নিয়ে আসা। বল কুড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু ঘন ঘন কামাই করে সে চাকরিটা খুইয়েছে। এদিকে তার বাড়িতে বিবি-বাচ্চা নিয়ে খাওয়ার লোক ছ'জন।

সুলেমানের বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। দেখতে বেঁটে, রোগা আর গায়ের রঙ তামাটে। মাথাভরা খুসকি আর বড় বড় লাল চুল। সে ছেলেবেলা থেকে শেরশায়রীর ভক্ত। লিখতে পারে। খন্দকারের দোকানে গিয়ে রোজ উর্দু আখওয়ার 'আজাদ' পড়ে। দু-চারটে ইংরেজি শব্দও জানে। বাংলায় কথা বলতে তার কেমন ইজ্জতে লাগে। কারণ তার ধারণা, তার পূর্বপুরুষরা ঘোড়ায় চেপে ভারত জয় করতে এসেছিল। খোঁজাখুজি করলে শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শা জাফরের সঙ্গেও হয়তো তার রিস্তেনাতে বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, বাংলা ছাড়া আর কোনো ভাষায় সে কথা বলতে পারে না। তাই বাংলার মাঝখানে সে উর্দু, হিন্দি শব্দ ঢুকিয়ে দেয়। উর্দু শের আবৃত্তি করে। প্রিন্স রহিমুদ্দিন লেনের লোকেরা তাকে ঠাট্টা করে বলে, দিওয়ানা। সুলেমান গায়ে মাখে না। আপন মনে আওড়ায়; নহ্ ওহ্ শাহ্ হ্যায় দয়ার হ্যায়। নহ্ ওহ্ তাজ হ্যায় নহ্ ওহ্ তখ্ হ্যায়। সেই সম্রাট নেই সেই নগর নেই। সেই মুকুট নেই সেই সিংহাসন নেই।

কয়েক মাস হলো সুলেমান নতুন একটা কাজ পেয়েছে। যে কাজ তার মোটেই পছন্দ নয়। এক কাবলীওয়ালার কাছে সে চাকরি পেয়েছে। তার কাজটা কি বলছি। তার কাজ সুদের টাকা আদায় করা। যেসব ভদ্রলোক বিপদে পড়ে রেস খেলে বা মদ খেয়ে ফতুর হয়ে বাধ্য হয়ে কাবলীওয়ালার কাছ থেকে টাকা ধার করেন, তাঁদের কারও পছন্দ নয়, সুদের টাকা বা কিস্তির টাকা আদায় করতে কাবলীওয়ালা গিয়ে তাঁদের বাড়িতে বা অফিসে হাজির হয়। সবাই অফিসের সহকর্মী, প্রতিবেশী অনেকে এমনকি নিজের বাড়ির লোকের কাছেও কাবলীওয়ালার কাছ থেকে টাকা ধার করার কথা গোপন রাখতে চায়। সেজন্য দরকার নিরীহ চেহারার একজন লোক। যার চোখ-মুখ বা পোষাক দেখে কোনোরকম সন্দেহ হবে না। সুলেমান সেই লোক। সে নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট জায়গায় যায় সুদ আদায় করতে, কিস্তির টাকা আদায় করতে। এই কাজটা শুধু ঝামেলার নয়, সুলেমান জানে, যাঁদের কাছে সে যায় তাঁরা তাকে পছন্দ করে না। বিরক্ত হয় নফরৎ করে। অনেকেই কথা রাখে না। বার বার ঘোরায়! অনেক সময় যত টাকা দেওয়ার কথা তার চাইতে কম টাকা দিতে চায়। কেউ কেউ মেজাজ দেখায়। দু-একজন বেপাত্তা হয়ে যায়। এদিকে দশ-পনেরো দিন হলো এক নতুন কাবলীওয়ালা এসেছে সে খুব কড়া মেজাজের লোক। নতুন মালিক সুলেমানকেও বোধহয় সন্দেহ করে, সুলেমান ঠিকমতো তাগাদায় বেরয় না, টাকা আদায় করে খরচ করে ফেলে। কিন্তু খুদাকে ওয়াস্তে সুলেমানের কোন দোষ নেই।

পুরনো কাবলীওয়ালা, পুরনো মালিক এরকম ছিল না। সে সুলেমানকে পছন্দ করতো। কিন্তু তার অনেক দোষ ছিল। সে জানতো না, বাজারে মুহব্বৎমেঁ নহ্ দিল্ বেচ তু অপনা বিক জাতা হ্যায় সাথ উসকে জফর বেচনেওয়ালা। প্রেমের হাটে নিজের হৃদয় বিক্রি করো না। বিক্রি করতে গেলে তার সঙ্গে বিক্রেতাও বিকিয়ে যায়।

রাসবিহারী মোড়ের কাছে একটা দোকানে মেয়েরা চা-খাবার পরিবেশন করে। সুলেমানের পুরনো মালিক সেখানে যেত। সেখানে এক সুন্দরীর প্রেমের মজায় তার নিজেকেবিক্রি করে দেওয়ার অবস্থা! কি করে আফগানিস্তানে খবর গেল। সুলেমানের মালিকের বড় ভাই এসে উপস্থিত। সুদের কারবার টারবারে বাজারে পাওনা ছিল পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা। তার মধ্যে বেশ কিছু অনাদায়ী। মালিকের বড় ভাই সুলেমনের নতুন মালিকের কাছে চল্লিশ হাজার টাকায় কারবার বিক্রি করে ভাইকে বগলদাবা করে দেশে ফিরে গেল। সুলেমানের ভয় হয়েছিল তার চাকরিটা এবার যাবে। কিন্তু নতুন কাবলীওয়ালা তাকে বহাল রেখেছে। পুরনো খাতকদের সুলেমান চেনে। কার কাছ থেকে কিভাবে টাকা আদায় করতে হয় এসব তার জানা, হয়তো এই কারণে। কিন্তু নতুন কাবলীওয়ালা সুলেমানকে পুরোপুরি বিশ্বাসও করে না। আজেবাজে কথা বলতেও ছাড়ে না। কিন্তু সুলেমান কি করবে? নোকরি তো তাকে করতেই হবে। সে তার সাধ্যমতো মন দিয়েই কাজ করে। তবু প্রতি মাসে আদায় সমান হয় না। কিন্তু আদায় যে কম হয় তার জন্য সে দায়ী নয়। তার কসুর কি? যে যেদিন টাকা দেবে বলে সেদিন সে তার কাছে হাজির হয়। কিন্তু সবাই কথা রাখে না। সুলেমান তো তাদের সঙ্গে মারপিট করতে পারে না। কিন্তু তার মালিক কিছুই বুঝতে চায় না। গালি দিয়ে বলে, তোমরা সব হারামখোর। কিন্তু পুরানা জামানা ভুলে যাও এসব চলবে না।

সুলেমান ভাবে, তকদীর মেরী! পুরানা জমানায় সেকি এই মালিকের আগের মালিককে বলেছিল, মায়খানাতে গিয়ে পড়ে থাকতে, না বলেছিল, রূপের শমায় পরোয়ানা হয়ে পুড়ে মরতে? সুলেমানের বলার প্রশ্ন ওঠে না। এখনকার মালিককেও তার কিছু বলার নেই। তার সব চাইতে অসহ্য লাগে যখন এই মালিক তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করার চেষ্টা করে। কিন্তু সুলেমানের একদিকে পাওনাদার কাবলীওয়ালা আর একদিকে খাতক ভদ্রলোকরা। তার কাজ পাওনাদারের হয়ে খাতকদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা। পাওনাদার ছেড়ে না দিলে সে কারও ধার ছেড়ে দিতে পারে না আবার খাতক পাওনা টাকা না দিলে সে টাকা আদায় করতে পারে না। সে মাঝখানে পড়ে গেছে। আদায় করতে গেলে খাতক চোখ রাঙায়। আদায় না হলে পাওনাদার চোখ রাঙায়।

সুলেমানের বাদশাহী মেজাজের ওপর ধুলো জমে। সুলেমানের বউ শুকিয়ে শুকিয়ে বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যায়। ছেলেপুলেগুলোর শুধু মুখের হা বাড়ে, শরীর সেরকম বাড়ে না। এই নোকরী ছাড়তে পারলে ভাল হতো কিন্তু সুলেমান মজবুর।

মাঝে মাঝে দু-একজন খাতকের জন্য সুলেমানের কষ্টও হয়। দারিদ্র্য কি জিনিস তার চাইতে আর কে ভাল করে জানে? সাধ করে কেউ কাবলীওয়ালার কাছে টাকা ধার করে না। নেশা বা রেসের জন্যও সবাই টাকা নেয় না। অনেকের টাকা শোধ করার ক্ষমতা সত্যিই নেই। কিন্তু টাকার লেনদেন সুলেমানের হাত দিয়ে হলে কি হবে টাকার মালিক সুলেমান নয়। সে কারও পাওনা ছেড়ে দিতে পারে না।

অন্যদিকে মালিকের উদ্বেগের কারণও সে বোঝে। প্রায় ডুবে যাওয়া একটা ধারের কারবার সে কিনেছে। কিনেছে, কারবার চালাচ্ছে কিন্তু তার ওপর খবরদারি করার লোকও আছে। আফগানিস্তান থেকে প্রায়ই তার বাবার চিঠি আসে। সুলেমানের বর্তমান মালিকের কোন রকম নেশা নেই। কিন্তু আগের কাবলীওয়ালা যে এখানে এসে বয়ে গিয়েছিল তা এখনকার কাবলীওয়ালার বাবা কখনও ভুলতে পারে না। সেজন্য সুলেমানের নয়া মালিককে সব সময় ব্যস্ত থাকতে হয়। প্রতি মাসের আদায়ের ওপর কড়া নজর না-রাখলে চলে না।

এই হলো দুদিকের অবস্থা। তার মাঝখানে সুলেমান। মাঝে মাঝে সে হাঁপিয়ে ওঠে। কোনদিকে যাবে সে। ইচ্ছে করে কিস্তির টাকা দেয় না, দিতে দেরী করে এমন লোকেরও অভাব নেই। রোজই বলে, আজ নয় কাল। সুলেমান যায় আর খালি হাতে ফিরে আসে। মালিক ভাবে, সুলেমানের গাফিলতির জন্য আদায় হচ্ছে না। সুলেমান ভাবে, আগে বাদশাহ্‌রা